أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/J/66) www.motaher21.net

نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ

"তা থেকে উত্তম"

" We bring a better one."

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১০৬

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَاۤ اَوْ مِثْلِهَاؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

আমি যে আয়াতকে ‘মানসুখ’ করি বা ভুলিয়ে দেই, তার জায়গায় আনি তার চাইতে ভালো অথবা কমপক্ষে ঠিক তেমনটিই।

১০৭ আয়াতে

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ السَّمَٰوٰتِ وَالْأَرْضِۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

আপনি কি জানেন না যে, আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র? আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবকও নেই, নেই সাহায্যকারীও।

১০৬ ও ১০৭ আয়াতের তাফসীর:

نَسخ (নসখ) এর আভিধানিক অর্থ হল, নকল করা। কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় তা হল, কোন বিধানকে রহিত করে তার পরিবর্তে অন্য বিধান অবতীর্ণ করা। আর এই রহিতকরণ বা পরিবর্তন হয়েছে আল্লাহরই পক্ষ থেকে। যেমন, আদম (আঃ)-এর যুগে সহোদর ভাই-বোনদের আপোসে বিবাহ বৈধ ছিল। পরবর্তীকালে তা হারাম করা হয়। এইভাবে কুরআনেও আল্লাহ কিছু বিধানকে রহিত করে তার পরিবর্তে নতুন বিধান অবতীর্ণ করেছেন। এর সংখ্যার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। শাহ ওলীউল্লাহ 'আল-ফাউযুল কাবীর' নামক কিতাবে এর সংখ্যা পাঁচ বলেছেন। এই রহিতকরণ তিন প্রকারের হয়েছেঃ যথা

(ক) সাধারণভাবে বিধান রহিতকরণঃ অর্থাৎ, কোন বিধান (আয়াতসহ) রহিত করে তার স্থলে অন্য বিধান (ও আয়াত) অবতীর্ণ করা হয়েছে।

(খ) তেলাঅত ব্যতিরেকে বিধান রহিত করা। অর্থাৎ, প্রথম বিধানের আয়াতগুলো কুরআনে বিদ্যমান রাখা হয়, তার তেলাঅতও হয় আবার দ্বিতীয় বিধানও যা পরে অবতীর্ণ করা হয় তাও কুরআনে বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ, 'নাসেখ' (রহিতকারী) এবং 'মানসুখ' (রহিতকৃত) উভয় আয়াতই বিদ্যমান থাকে।

(গ) কেবল তেলাঅত রহিত করা। অর্থাৎ, নবী করীম (সাঃ) ঐ আয়াতকে কুরআনের মধ্যে শামিল করেননি, কিন্তু তার বিধানের উপর আমল বহাল রাখা হয়েছে। যেমন,

{وَالشَّيْخُ وَالشَّيخَةُ إِذَ زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا الْبَتَّةَ}"বৃদ্ধ (বিবাহিত) পুরুষ ও বৃদ্ধা (বিবাহিতা) নারী যদি ব্যভিচার করলে, তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই পাথর মেরে হত্যা কর।" (মুআত্তা ইমাম মালিক) আলোচ্য আয়াতে 'নাসখ'এর প্রথম দুই প্রকারের বর্ণনা রয়েছে। "((مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ)) শব্দে দ্বিতীয় প্রকারের এবং "((أَوْ نُنْسِهَا)) শব্দে প্রথম প্রকারের নসখের কথা বলা হয়েছে। "((نُنْسِهَا)) (আমি ভুলিয়ে দিই)এর অর্থ হল, তার বিধান ও তেলাঅত দুটোই উঠিয়ে নিই। যেন আমি তা ভুলিয়ে দিলাম এবং নতুন বিধান নাযিল করলাম। অথবা নবী করীম (সাঃ)-এর হৃদয় থেকেই আমি তা মিটিয়ে দিয়ে একেবারে বিলুপ্ত করে দিলাম। ইয়াহুদীরা তাওরাতের বাক্য রহিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করত। ফলে কুরআনের কিছু আয়াত রহিত হওয়ার কারণে তার উপরও আপত্তি উত্থাপন করল। মহান আল্লাহ তাদের খন্ডন করে বললেন, যমীন ও আসমানের রাজত্ব তাঁরই হাতে। তিনি যা উচিত মনে করেন তা-ই করেন। যে সময় যে বিধান লক্ষ্য ও কৌশলের দিক দিয়ে উপযুক্ত মনে করেন, সেটাকেই তিনি বহাল করেন এবং যেটাকে চান রহিত ঘোষণা করেন। এটা তাঁর মহাশক্তির এক নিদর্শন। পূর্বের কিছু ভ্রষ্টলোক (যেমন, আবূ মুসলিম আসফাহানী মু'তাযেলী) এবং বর্তমানের কিছু লোক ইয়াহুদীদের মত 'নসখ' মানতে অস্বীকার করেছে। তবে সঠিক কথা তা-ই যা পূর্বের আলোচনায় সুস্পষ্ট হয়েছে। 'নসখ' সুসাব্যস্ত হওয়ারই আকীদা রাখতেন পূর্বের সলফগণ।

‘নাসখ’ এর মূল তত্ত্ব

ইবনে আবু তালহা ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বলেন যে, ‘নাসখ’ এর অর্থ হচ্ছে পরিবর্তন। (তাফসীর তাবারী ২/৪৭৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে সরিয়ে দেয়া, যা লেখার সময় কখনো অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু হুকুম পরিবর্তন হয়ে যায়। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/৩২১) ইবনে মাস ‘উদ (রাঃ) এর ছাত্র আবুল ‘আলিয়া (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইবনে কা ‘ব আল কারাযী (রহঃ)-ও এ রকমই বর্ণনা করেছেন। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/৩২২) যাহ্‌হাক (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ভুলিয়ে দেয়া। ‘আতা (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ ছেড়ে দেয়া। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ মুছে ফেলা। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/৩২২) যেমন الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ‘বিবাহিত নারী-পুরুষ যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হবে তখন তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করো।’ অনুরূপভাবে মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثًا".

‘আদম সন্তানের জন্য সম্পদের দু’ টি পাহাড় থাকলেও তৃতীয় আরেকটি সে অনুন্ধান করে। (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী ১১/৬৪৩৯, সহীহ মুসলিম ২/১১৬, সুনান তিরমিযী ৪/২৩৩৭, সুনান দারিমী ২/২৭৭৮, মুসনাদ আহমাদ ৩/১২২, ১৯২, ১৯৮, ২৩৬)

ইমাম ইবনে জারীর (রহঃ) বলেন যে, মহান আল্লাহই আয়াতের হুকুম পরিবর্তন করে থাকেন। হালালকে হারাম, হারামকে হালাল, জায়িযকে নাজায়িয এবং নাজায়িয কে জায়িয ইত্যাদি নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা, বাধা ও অনুমতি এবং বৈধ ও অবৈধ কাজে ‘নাসখ’ হয়ে থাকে। তবে যে সংবাদ দেয়া হয়েছে বা যে ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তাতে রদ-বদল এবং নাসিখ ও মানসূখ হয় না। ‘নাসখ’ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে নকল করা। যেমন একটি গ্রন্থ থেকে আর একটি গ্রন্থ নকল করা। এরকমই এখানেও যেহেতু একটি নির্দেশের পরিবর্তে আর একটি নির্দেশ দেয়া হয় এ জন্য একে ‘নাসখ’ বলে, এটা নির্দেশের পরিবর্তন অথবা শব্দেরই পরিবর্তন হোক।

‘নাসখ’ এর মূল তত্ত্বের উপর মূলনীতির ‘আলেমগণের অভিমত

এ জিজ্ঞাস্য বিষয়ে ধর্মীয় মূলনীতির ‘আলেমগণের ব্যাখ্যা বিভিন্ন রূপ হলেও অর্থ হিসেবে সবগুলো প্রায় একই। ‘নাসখ’ এর অর্থ হচ্ছে, কোন শার ‘ঈ নির্দেশ পরবর্তী দালীলের ভিত্তিতে সরে যাওয়া। কখনো সহজের পরিবর্তে কঠিন এবং কখনো কঠিনের পরিবর্তে সহজ হয়, আবার কখনো বা কোন পরিবর্তনই হয় না। তাবারানী (রহঃ) এর হাদীস গ্রন্থে একটি হাদীস আছে যে, দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট হতে একটি সূরা মুখস্থ করেছিলেন। সূরাটি তারা পড়তেই থাকেন। একবার রাতের

সালাতে সূরাটি তারা পড়ার ইচ্ছা করেন কিন্তু কোনক্রমেই স্মরণ করতে পারেন না। হতবুদ্ধি হয়ে তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে উপস্থিত হোন এবং ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন তাদেরকে বলেনঃ ‘এটা মানসূখ হয়ে গেছে এবং এর পরিবর্তে উত্তম দেয়া হয়েছে। তোমাদের অন্তর হতে এটা বের করে নেয়া হয়েছে। দুঃখ করো না, নিশ্চিত থাকো।’ (হাদীসটি য ‘ঈফ। আল মাজমা ‘উয যাওয়ায়িদ ৬/৩১৫, অত্র হাদীসের সনদে সুলায়মান ইবনে আরকাম নামের একজন রাবী আছেন তিনি মাতরূক তথা বর্জনীয়)

ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ)-এর তাফসীরে বর্ণনা করেনঃ ‘অর্থাৎ আমি একে ছেড়ে দেই, মানসূখ করি না।’ ইবনে মাস ‘ঊদ (রাঃ)-এর ছাত্র বলেনঃ ‘অর্থাৎ আমি এর শব্দ ঠিক রেখে হুকুম পরিবর্তন করে দেই।’ আব্দ ইবনে উমাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং ‘আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে ‘অর্থাৎ আমি একে পিছনে সরিয়ে দেই।’ ‘আতিয়া আল আউফী (রহঃ) বলেনঃ ‘অর্থাৎ মানসূখ করি না।’ সুদ্দী (রহঃ) এবং রাবী ‘ ইবনে আনাস (রহঃ) ও এটাই বলেন। যাহ্হাক (রহঃ) বলেনঃ ‘অর্থাৎ নাসিখকে মানসূখের পিছনে রাখি।’ আবুল ‘আলিয়া (রহঃ) বলেনঃ ‘অর্থাৎ আমার নিকট সেটা টেনে নেই।’ ‘উমার (রাঃ) খুৎবায় نَنْسَاهَا পড়েছেন এবং এর অর্থ ‘পিছনে হওয়া’ বর্ণনা করেছেন। نُنْسِهَا পড়লে এর ভাবার্থ হবে ‘আমি সেটা ভুলিয়ে দেই।’ মহান আল্লাহ যে হুকুম উঠিয়ে নিতে ইচ্ছা করতেন সেটি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভুলিয়ে দিতেন।

সা ‘দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) نُنْسِهَا পড়তেন। এতে তাকে কাসিম ইবনে ‘আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন যে, সা ‘ঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রহঃ) তো একে نَنْسَاهَا পড়তেন। তখন তিনি বলেন যে, সা ‘ঈদ (রহঃ)-এর ওপর কিংবা তার বংশের ওপর কুর’ আন মাজীদ অবতীর্ণ হয়নি। মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى﴾

অচিরেই আমি তোমাকে পাঠ করাবো, ফলে তুমি বিস্মৃত হবে না। (৮৭ নং সূরা আ’ লা, আয়াত নং ৬)

তিনি আরো বলেনঃ ﴿وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ﴾

যদি ভুলে যাও তাহলে তোমার রাব্বকে স্মরণ করো। (১৮ নং সূরা কাহফ, আয়াত নং ২৪)

‘উমার (রাঃ) এর ঘোষণা রয়েছেঃ ‘আলী (রাঃ) উত্তম ফয়সালাকারী এবং উবাই (রাঃ) সবচেয়ে বেশি কুর’ আন পাঠক। আমরা ‘উবাই (রাঃ)-এর কথা ছেড়ে দেই। কেননা তিনি বলেন, ‘আমি যা মহান আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখে শুনেছি তা ছাড়বো না, অথচ মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘আমি যা মানসূখ করি বা ভুলিয়ে দেই, তা থেকে উত্তম বা তারই মত আনয়ন করি।’ (সহীহুল বুখারী, মুসনাদে আহমাদ)

‘তা হতে উত্তম হয়’ অর্থাৎ বান্দাদের জন্য সহজ ও তাদের আরাম হিসেবে, কিংবা ‘তারই’ মতো হয়। কিন্তু মহান আল্লাহ্র দূরদর্শিতা তার পরেরটাতেই রয়েছে।

মহান আল্লাহ তাঁর আয়াতের পরিবর্তন করেন, যদিও ইয়াহুদীরা তা অবিশ্বাস করে

মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ﴾

সৃষ্টজীবের পরিবর্তনকারী এবং সৃষ্টি ও হুকুমের অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ। তিনি যাকে যেভাবে চান সেভাবেই গঠন করেন। তিনি যাকে চান ভাগ্যবান করেন এবং যাকে চান হতভাগ্য করেন। যাকে চান সুস্থতা দান করেন এবং যাকে চান রোগাক্রান্ত করেন। যাকে চান ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যাকে চান দুর্ভাগা করেন। বান্দাদের মধ্যে তিনি যে হুকুম জারী করতে চান তাই জারী করেন। যা চান হারাম করেন, যা চান হালাল করেন, যা চান অনুমতি দেন এবং যা চান নিষেধ করেন। তিনি ব্যাপক বিচারপতি। তিনি যা চান সেই হুকুমই জারী করেন, তাঁর হুকুম কেউ অগ্রাহ্য করতে পারে না। তিনি যা চান তাই করেন। কেউই তাঁকে বাধা দান করতে পারে না। তিনি বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন এবং দেখেন যে, তারা নবী ও রাসূলদের কিরূপ অনুসারী হয়। তিনি কোন যৌক্তিকতার কারণে নির্দেশ দেন, আর কোন যৌক্তিকতার কারণে ঐ হুকুমেই সরিয়ে দেন। তখন পরীক্ষা হয়ে যায়। ভালো লোকেরা তখনো আনুগত্যে প্রস্তুত ছিলো এবং এখনো আছে। কিন্তু যাদের অন্তর খারাপ তারা সমালোচনা শুরু করে দেয় এবং নাক মুখ ঘুরিয়ে থাকে। অথচ সমস্ত সৃষ্টজীবের সৃষ্টিকর্তার সমস্ত কথাই মেনে নেয়া উচিত এবং সর্বাবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ করা উচিত। তিনি যা বলেন তা সত্য জেনে পালন করা এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ ইয়াহূদীদের মিথ্যা দাবী খণ্ডন করে মুসলিমদের সুখবর দিচ্ছেন যে, অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা সত্যের ওপর নেই। ভালো-মন্দ উভয় বিষয় মহান আল্লাহ্‌র অধীন, তারা দাবী করতো যে, তাদের ওপর অবতীর্ণ কিতাবের বাণীর কোন পরিবর্তন হবে না। এটা ছিলো তাদের মূর্খতা ও অহমিকার কারণে।

ইমাম আবু জা ‘ফর ইবনে জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছেঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জানো না যে, নভোমণ্ডল ভূমণ্ডলের একচ্ছত্র মালিক একমাত্র আমি? তাদের ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিকও আমিই। আমি যা ইচ্ছা তা বাতিল করি, পরিবর্তন করি অথবা সংশোধন করি; আমার আদেশের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার কেউ নেই।

অত্র আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃত পক্ষে এটা ইয়াহুদী দের কথার প্রতিবাদেই বলা হয়েছে। তারা ইঞ্জিল ও কুর’ আনকে মানতো না। কারণ এই যে, এ দু’ টির মধ্যে তাওরাতের কতোগুলো হুকুম পরিবর্তন হয়েছে। আর এই একই কারণে তারা এই নবীগণকেও স্বীকার করতো না। এটা শুধু অবাধ্যতা ও অহঙ্কারই বটে। নচেৎ বিবেক হিসেবে তা ‘নাসখ’ অসম্ভব নয়। কেননা মহান আল্লাহ স্বীয় কাজে সর্বাধিকারী। তিনি যা চান ও যখন চান সৃষ্টি করে থাকেন। যা চান, যেভাবে চান সেভাবে রাখেন। আর এভাবেই যা চান এবং যখন চান হুকুম করেন। এটা স্পষ্ট কথা যে, তাঁর হুকুমের ওপর কারো হুকুম হতে পারে না। (তাফসীর তাবারী ২/৪৮৮)

আদম (আঃ)-এর সন্তানেরা পরস্পর ভাই বোন হতো। কিন্তু তাদের মধ্যে বিয়ে বৈধ ছিলো। অতঃপর পরবর্তী যুগে এটা হারাম করে দেয়া হয়েছে। নূহ (আঃ) যখন নৌকায় উঠেন তখন সমুদয় প্রাণীর গোশত বৈধ রাখা হয়। কিন্তু পরে কতোগুলোর গোশত অবৈধ ঘোষণা করা হয়। দু' বোনকে এক সাথে বিয়ে করা ইয়া 'কূব (আঃ) এবং তাঁর সন্তানদের জন্য বৈধ ছিলো। অতঃপর তাওরাতে এবং তার পরও অবৈধ করে দেয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ) কে তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আঃ) কে কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু কুরবানীর পূর্বেই এই হুকুম মানসূখ করে দেয়া হয়। বানী ইসরাঈলকে হুকুম দেয়া হয়েছিলো যে, যারা বাছুর পূজা করেছিলো তাদেরকে যেন তারা হত্যা করে; অথচ অনেক বাকি কথাতেই এ হুকুম উঠিয়ে নেয়া হয়। এরকম আরো বহু ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। আর স্বয়ং ইয়াহুদীরাও এটা স্বীকার করে। কিন্তু তথাপিও তারা কুর' আন মাজীদকে এবং শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ বলে মানছে না যে, মহান আল্লাহ্‌র কালামের পরিবর্তন অপরিহার্য হচ্ছে এবং এটা অসম্ভব।

অত্র আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ নসখের বৈধতা করে ঐ অভিশপ্ত দলের দাবী খণ্ডন করেছেন। সূরাহ আলি 'ইমরানের মধ্যেও যার প্রারম্ভে বানী ইসরাঈলকে সম্বোধন করা হয়েছে, তাতেও নাসখ সংঘটিত হওয়ার বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন, প্রত্যেক খাদ্য বানী ইসরাইলের ওপর হালাল ছিলো, কিন্তু ইসরাঈল ইয়া 'কূব (আঃ) তার ওপর যে জিনিস হারাম করে নিয়েছিলো সেটা তাদের ওপরও হারাম করা হয়েছে। এর বিস্তারিত তাফসীর ইনশা' আল্লাহ যথাস্থানে আসবে। সব মুসলমানই এতে একমত যে, মহান আল্লাহ্‌র হুকুমের মধ্যে নাসখ হওয়া বৈধ, বরং সংঘটিত হয়েও গেছে এবং এতেই আল্লাহ তা 'আলার পূর্ণ নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে।

মুফাস্‌সির আবূ মুসলিম ইস্পাহানী (রহঃ) লিখেছেন যে, কুরআনের মধ্যে নাসখ সংঘটিত হয়নি। কিন্তু তার এই কথা দুর্বল ও প্রত্যাখ্যান যোগ্য। কুর' আন মাজীদের যেখানে নাসখ বিদ্যমান রয়েছে এর উত্তর দিতে গিয়ে যদিও তিনি বহু পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু সবই বিফল হয়েছে। যে স্ত্রী লোকের স্বামী মারা যায় তার অন্যত্র বিয়ে সিদ্ধ হওয়ার জন্য পূর্বে সময়কাল ছিলো এক বছর। কিন্তু পরে এর জন্য সময় করা হয়েছে চার মাস দশ দিন এই দুটো আয়াতেই কুর' আন পাকের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে নাসখকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি কোন গ্রহণযোগ্য উত্তর দিতে পারেননি। পূর্বে কিবলাহ ছিলো বায়তুল মোকাদ্দাস। কিন্তু পরে পবিত্র কা 'বাকে কিবলাহ করা হয়েছে। এর উত্তরেও তিনি কিছুই বলতে পারেন নি। দ্বিতীয় আয়াতটি স্পষ্ট এবং প্রথম আয়াতটি আনুষঙ্গিক ভাবে বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে মুসলমানদের ওপর এই নির্দেশ ছিলো যে, তারা এক একজন মুসলমান দশ জন কাফিরের মুকাবিলা করবে এবং পিছনে সরে আসবে না। কিন্তু পরে এ হুকুম নাসখ বা রহিত করে দিয়ে একজন মুসলমানকে দু' জন কাফিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং দু' টি আয়াতই মহান আল্লাহ্‌র কালামে বিদ্যমান রয়েছে।

পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে আলাপ করার আগে কিছু সাদাকাহ করার নির্দেশ ছিলো। পরে এটা মানসূখ করে দেয়া হয়। আর এ দু’ টি আয়াতই কুর’ আনুল কারীমের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। মহান আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন।

এ ছাড়া আরো উদাহরণ রয়েছে যে, ইয়াহুদীরা তাওরাতের মাধ্যমে যে সমস্ত বিষয় বিশ্বাস করতো সে সব সংঘটিত হওয়ার পর তারা তা অগ্রাহ্য করেছে। এটাতো স্পষ্ট জানা কথা যে, তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমন এবং তাঁকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো এই যে, আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে যদি তারা অনুসরণ না করে এবং তাঁর প্রচারিত ধর্মের আইন কানুন মেনে না চলে তাহলে তাদের কোন ভালো কাজই মহান আল্লাহ কবূল করবেন না। তাওরাতের পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভিন্ন কিতাব কুর’ আনুল কারীমসহ প্রেরণ করা হয়েছে, যা সকলের জন্য ‘আমল করার সর্বশেষ কিতাব।

ইহুদিরা মুসলমানদের মনে যেসব সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাতো তার মধ্য থেকে একটি বিশেষ সন্দেহের জবাব এখানে দেয়া হয়েছে। তাদের অভিযোগ ছিল, পূর্ববর্তী কিতাবগুলো যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থেকে থাকে এবং এ কুরআনও আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তাহলে ঐ কিতাবগুলোর কতিপয় বিধানের জায়গায় এখানে ভিন্নতর বিধান দেয়া হয়েছে কেন? একই আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিধান কেমন করে হতে পারে? আবার তোমাদের কুরআন এ দাবী উত্থাপন করেছে যে, ইহুদিরা ও খৃস্টানরা তাদেরকে প্রদত্ত এ শিক্ষার একটি অংশ ভুলে গেছে। আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা হাফেজদের মন থেকে কেমন করে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে? সঠিক অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তারা এসব কথা বলতো না। বরং কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হবার ব্যাপারে মুসলমানদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তারা এগুলো বলতো। এর জবাবে আল্লাহ বলেছেনঃ আমি মালিক। আমার ক্ষমতা সীমাহীন। আমি নিজের ইচ্ছে মতো যে কোন বিধান ‘মান্‌সুখ’ বা রহিত করে দেই এবং যে কোন বিধানকে হাফেজদের মন থেকে মুছে ফেলি। কিন্তু যে জিনিসটি আমি ‘মান্‌সুখ’ করি তার জায়গায় তার চেয়ে ভালো জিনিস আনি অথবা কমপক্ষে সেই জিনিসটি নিজের জায়গায় আগেরটির মতই উপযোগী ও উপকারী হয়।

১০৬ ও ১০৭ আয়াতের তাফসীর:

النسخ এর শাব্দিক অর্থ: দূরিভূত করা, শরীয়তের পরিভাষায়: চলমান কোন শরঈ বিধানকে পরবর্তী বিধান দ্বারা রহিত করাকে النسخ বলা হয়। কুরআনের এক আয়াত বা অংশ দ্বারা অন্য আয়াত বা অংশকে রহিত করার ব্যাপারে সকল আলেম একমত। তবে সুন্নাত দ্বারা কুরআনের কোন আয়াত বা অংশকে রহিত করার ব্যাপারে দু’ টি মত রয়েছে:

১. কুরআন, মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা মানসূখ হতে পারে। এ বিষয়ে তিন ইমাম (ইমাম মালেক, আবূ হানিফা ও আহমাদ) একমত। কেননা উভয়টাই ওয়াহী।

আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

)وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰي(

“এবং তিনি প্রবৃত্তি হতেও কথা বলেন না। এটা তো এক ওয়াহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।” (সূরা নাজম ৫৩:৩-৪)

২. মুতাওয়াতির নয় এমন হাদীস (খবরে আহাদ) দ্বারা কুরআনকে মানসূখ করার ব্যাপারে অধিকাংশ আলেম না-যায়েজ বলেছেন। কেননা কুরআন দ্বারা ইয়াকিন বা দৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হয় কিন্তু হাদীস দ্বারা তা হয় না।

কুরআনে নাসখ বা রহিতকরণ তিন প্রকার রয়েছে:

(ক) কোন আয়াত বিধানসহ রহিত করে তার স্থলে অন্য নতুন আয়াত ও বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছে।

(খ) তেলাওয়াত বহাল রেখে আয়াতের বিধান রহিত করা হয়েছে।

(গ) কেবল তেলাওয়াত রহিত করা হয়েছে বিধান বহাল আছে। যেমন:

(والشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة)

“বৃদ্ধ (বিবাহিত) পুরুষ ও বৃদ্ধা (বিবাহিতা) নারী যদি ব্যভিচার করে তাহলে তাদেরকে অবশ্যই পাথর মেরে হত্যা কর।” (মুআত্তা ইমাম মালেক)

ইয়াহূদীগণ আয়াত রহিতকরণ হওয়াকে অস্বীকার করে। তাদের দাবি যদি কোন আয়াত রহিত করে নতুন আয়াত দেয়া হয় তাহলে এটা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা ‘আলা পূর্বে জানতেন না এ আয়াত বান্দাদের জন্য উপযোগী নয়। তাই পরিবর্তন করে নতুন আয়াত প্রদান করা প্রয়োজন দেখা দেয়। অতএব আয়াত রহিতকরণ বলতে কিছু নেই। ইয়াহূদীদের এ সব কথা ভ্রান্ত, কেননা আল্লাহ তা ‘আলা, কোন বিধান রহিত করেন কয়েকটি কারণে:

১. বান্দাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তাদের মধ্য হতে ঈমানের ওপর বহাল থাকে আর কে থাকে না।

২. বান্দাদের জন্য সহজ করার জন্য, অর্থাৎ পূর্বের বিধানের চেয়ে পরবর্তী বিধান সহজ। কেননা তিনিই বলছেন- আয়াতকে রহিত করে উত্তম কিছু নিয়ে আসেন।

৩. সর্বোপরি আল্লাহ তা ‘আলা সবকিছুর মালিক, তাঁর মালিকত্বে সবকিছু করার অধিকার রয়েছে, এর জন্য তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)

“তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।” (সূরা আম্বিয়াহ ২১:২৩)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রাঃ) বললেন: উবাই বিন কা ‘ব (রাঃ) আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কারী, আর আলী (রাঃ) আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক। কিন্তু আমরা উবাই বিন কা ‘ব (রাঃ)-এর কিছু কথা বাদ দেই। কারণ উবাই বিন কা ‘ব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যা শুনেছি তার কিছুই ছাড়ব না। অথচ আল্লাহ তা ‘আলা বলেন: আমি যে আয়াত রহিত করি অথবা ভুলিয়ে দেই। (সহীহ বুখারী হা: ৪৪৮১) অর্থাৎ কুরআনের অনেক মানসূখ বিধান রয়েছে যার প্রতি আমল করা রহিত করা হয়েছে। তাই উবাই (রাঃ) এর কথা এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নয়।

তারপর আল্লাহ তা ‘আলা জানিয়ে দিচ্ছেন, আকাশ ও জমিনের রাজত্বের একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর। সুতরাং তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। তিনি কোন আয়াতকে রহিতও করতে পারেন। অতএব আমাদের ঈমান রাখতে হবে, কুরআনে নাসেখ মানসূখ উভয়ই রয়েছে, এসব আল্লাহ তা ‘আলার হিকমতের অন্তর্ভুক্ত।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. শরীয়তের পূর্ববর্তী বিধানকে পরবর্তী বিধান রহিত করতে পারে। তবে কিয়াস ও ইজমা শরীয়তের কোন বিধানকে রহিত করতে পারে না।

২. কোন বিধানকে রহিত করা মু’ মিনদের ওপর আল্লাহ তা ‘আলার অনুগ্রহ ও তাঁর সার্বভৌমত্বের বহিঃপ্রকাশ।